International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-V, March 2016, Page No. 14-17
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

নির্বাচিত রচনায় দেশভাগের বিতাড়ন লিপি

ড. ইন্দিরা ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, এস এস কলেজ, হাইলাকান্দি, আসাম, ভারত

Abstract

Partition does not refer to political and geographical separation only, it also means dissection in society and culture and more particularly breaking of heart of the people. Primarily from the forties to fifties was the era of great disintegration and degeneration in the history of Bengalis –hostilities, famine and starvation, riots, in the midst of all these the Bengalis could not celebrate and relish the joy of freedom and independence of the country. That was simply because of the fact that for the Bengalis the pain of partition was in-built in the pleasure of independence. In the Bengali society the backdrop and background of partition took root much before the independence and that was simply accomplished in 1947. In fact, partition of the country started impacting the Bengali society since the beginning of the Second World War. It is for this reason country's partition, communal riots and immigrant problems created a remarkable chapter in the history of independence. Partition and problem of migrant once again came into the surface after the emergence of Bangladesh as an independent nation. As a result the literature of partition of Bengal added a new dimension. Bengali writers of new generations became active of writing history of traditions. Here in this paper an attempt has been made to portray how the Autobiographical book of Sujit Choudhury "Haranodin and Harano Manush" second part clearly recorded the inhumane and ruthless extradition of Hindus out of Pakistan immediately after partition. The writer himself and his family also became the victim of the situation. Attempt has also been made to depict how Malay Kanti Dey's short story "Asrafalir Swadesh" documented the tremendous pain of a family displaced due to partition and how like Asrafali many by proving them foreigners falsely deported across the border in the darkness of night. So partition of the country is such a wound in the life of Bengalees of which we may get relief for the time being but we will not be able to get rid of the pain altogether.

Key words: Partition, Bengali, Society.

"তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো তার বেলা।" (অন্নদাশংকর রায়)

ভারতবর্ষ হিন্দু-বৌদ্ধ রাজাদের শাসনকালে, পাঠান ও মোগল আমলেও অনেকবার সীমানা বদলেছে তাতে ভারতবাসীরা এতটা বিচলিত হয়নি, কিন্তু বিশ শতকে ভারতভাগ বা দেশভাগ এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি হিসেবে আজও সবার হৃদয়ে জাগরূক আছে। দেশভাগ মানে শুধু রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক বিভাজন নয় সমাজ সংস্কৃতির মধ্যেও ফাটল ধরা এবং বিশেষ করে মানুষের হৃদয়কেও দ্বিখণ্ডিত করা। ভারতের আকাশে স্বাধীনতা সূর্যের উদয় হলেও ঔপনিবেশিক অধীনতার অবসান ঘটিয়ে মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস সেদিন ফেলতে পারেনি। বিশ শতকের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সাল এই দশবছর বাঙালির ইতিহাসে এক মহাভাঙনের কাল-যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ সবকিছু মিলিয়ে স্বাধীনতার স্বাদ সেদিন বাঙালিরা প্রাণভরে উপভোগ করতে পারেনি। কারণ স্বাধীনতার আনন্দোপলব্ধির মধ্যেই নিহিত ছিল দেশভাগের কঠোর বা নির্মম বেদনা।

বাঙালি সমাজে স্বাধীনতার অনেক আগেই দেশভাগের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল ১৯৪৭-এ তা শুধু কার্যকারণে পরিণত হল। দেশভাগের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে দেখতে হলে প্রথমেই নজরে পড়ে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ যদিও তা পরবর্তীতে রদ করা হয়। সেদিন উদ্বাস্তুসমস্যা দেখা না দিলেও রাখীবন্ধন, বিলেতিদ্রব্য বর্জন ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে সম্মিলিত করার চেষ্টা চলেছিল। আবার, গোয়ালপাড়া, শ্রীহট্ট, কাছাড়ের বাঙালিরা বঙ্গচ্যুত হয়ে আসামের সঙ্গে যুক্ত হবার মধ্য দিয়েই অঙ্গচ্ছেদের যন্ত্রণা উপলব্ধি করেছিল এর আগেই। তাই দেশভাগের উপ্ত বীজ এসময়েই রোপিত হয়ে ৪৭-এ তা মহীরুহের আকার ধারণ করে।

দেশভাগের প্রত্যক্ষ প্রভাব বাঙালি সমাজে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকেই শুরু হয়েছিল। ভারতে যুদ্ধের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও শহরের লোক কলকাতা ছেড়ে পালাবার উপায় খুঁজতে থাকে। বাড়িঘর, সম্পত্তি ফেলে শহরের মানুষ শহুরে জীবনচর্চা ও মুল্যবোধ নিয়ে গ্রামে আস্তানা গেড়েছিল।

এই সময়ই বাংলার গ্রামজীবনের মানসিক উদ্বাস্তুদের চকিত আভাস দেখা দেয়। বাঙালি সমাজ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছাড়াই পরোক্ষভাবে এর বিস্তৃত প্রভাব প্রসারিত হয়েছিল ১৯৪৭-এ। ৪২- ভারতছাড়ো আন্দোলন, বাংলায় মর্মান্তিক মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রাণ হারায় যা ছিল সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব এবং কংগ্রেসের দ্বারা প্রত্যাখ্যান, নোয়াখালি দাঙ্গা – সব কিছুর ক্রমিক যোগফলেই দেশভাগের ট্র্যাজেডি।[১] প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, মাউন্টব্যাটেনকে ভারতে পাঠানোর সময় বলে দেওয়া হয়েছিল যে, ভারত ভাগ করেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। কিন্তু তিনি নিজে স্বীকার করেছেন যে ভারতকে অখন্ড রাখার জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসরা দেশের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেশকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গঙ্গা-পদ্মার জল রক্তে লাল হয়ে যায়। দেশবাসী এক লক্ষ্মীছাড়া জীর্ণ বাংলাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। তাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লগ্নে দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু সমস্যা ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করে রেখেছে।[২]

দেশভাগ ও বাঙালি উদ্বাস্তু সমস্যা আবার নতুন করে শুরু হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পর। মুজিবর রহমান হত্যার পর থেকে মৌলবাদী শক্তির অভ্যুত্থান, সেকুলার থেকে আবার ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া ইত্যাদি বাঙালি জীবনে আরেকবার খণ্ডিত হবার অভিশাপ নানা জটিল সমস্যার হাজির হতে থাকল।[৩] অনুপ্রবেশ, সংখ্যালঘু, উগ্রপন্থী, চোরাচালানকারী ইত্যাদি শব্দগুলো সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে যায়। বাঙালির ঐতিহ্য নিছক ধর্মভেদে দ্বিখণ্ডিত হলে উভয় প্রান্তে সাধারণ সমস্যা ও লক্ষণগুলো সবই এক ফলে আশি, নব্বই এবং নতুন শতকেও দেশভাগের সাহিত্য এক নতুন মাত্রা নেয়। বাঙালি নতুন প্রজন্মের লেখকরা পরম্পরার ইতিহাস সৃষ্টিতে সক্রিয় হলেন। দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে। প্রজন্মের পর প্রজন্মের মধ্যে অতীতকে দেখবার ও নানাভাবে বিচারের প্রক্রিয়া যেন আজও বয়ে চলেছে। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া হলেও বাস্তুচ্যুত বহু ভারতবাসী মানসিকভাবে যুক্ত হয় তাদের পূর্বজদের ভিটায়, চয়ন করে শৈশবের সোনালী মুহূর্তগুলো।

সুজিত চৌধুরীর আত্মকথামূলক গ্রন্থ 'হারানো দিন হারানো মানুষ' দ্বিতীয়পর্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে দেশভাগের অব্যবহিত পরেই পাকিস্তান থেকে কীভাবে হিন্দুরা বিতাড়িত হয়েছিল এর বিবরণ। লেখকের পিতা বিধুভূষন চৌধুরী এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট অংশ পাকিস্তানে পড়েছিল বলে হিন্দুদের এক বড়ো অংশকে নিজেদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে আসতে হয়। গণভোটে সিলেট পাকিস্তানের পক্ষে বেশি ভোট পড়ায় তা পাকিস্তানের দখলে চলে যায়। ধীরে ধীরে এর ফলে সিলেটের সামাজিক শান্তি নষ্ট হতে থাকে। ফলে লেখকের বাবাকে দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তিনি লিখেছেন, সেইসময় সিলেটে নোমানি সাহেব ডেপুটি কমিশনার হয়ে এলে পাকিস্তান কাকে বলে স্থানীয় হিন্দুদের বোঝাবার দায়িত্ব যেন তিনি ভালোভাবে পালন করতে থাকেন। তিনি লিগপন্থী যারা কট্টরপন্থী ওদের সহযোগিতায় হিন্দুদেরকে দেশ ছাড়ার বন্দোবস্ত করতে মরীয়া হয়ে ওঠেন। এরজন্য ১৯৫০ সালে জেলা থেকে হিন্দুদের বড়ো অংশটা বিতাড়িত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত সেই প্রাথমিক আঘাতের শিকার হয়েছিলেন লেখকের পরিবার। ডিসির হুকুমে মুন্সেফ সাহেবের পরিবারের তাদের বাড়ি জবরদস্তি দখল করা যেন অনেকটা নাটকের দৃশ্য পরিবর্তনের মতোই। লেখকের বাবার কোনো কথা না শুনেই মুন্সেফের লোকজন তাদের ঘরে প্রবেশ করে সমস্ত কাজ শুরু করে দিয়েছিল। সুজিত চৌধুরী লিখেছেন যে—

> "সকলের জীবনেই নানা ধরনের নাটকীয় মুহূর্ত আসে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিনা নোটিশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছাড়া ঠাণ্ডা মাথায় সরকারি দাপট দেখিয়ে যে কাউকে মুহূর্তের মধ্যে নিরাশ্রয় করা যায়, তাও একেবারে বিনা অপরাধে, তার কোনও নজির আগে-পরে কখনও পাই নি।"[৪]

লেখকের বাবাকে অনেকটা বিনা অপরাধে গলা ধাক্কা দিয়ে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। এরপরে চারদিন তারা সিলেটে ছিলেন যেন মোহগ্রস্তের মতো। বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জে পরিচিত আত্মীয়ের বাড়িতে প্রথম আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাদের। নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে একটি পরিবারকে সেদিন শেকড় থেকে ছিন্ন হতে হয়েছিল। লেখকের ভাষায়—

> "আমরা জন্মেছিলাম ভারতবর্ষে, পরে জানলাম সেটা আর ভারতবর্ষ নয়। এবারে তাই আবার ছুটেছি নতুন ভারতবর্ষের সন্ধানে। বাবাদের ভাবনায় আবার তা মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্নের ভারতবর্ষও বটে। রাজনৈতিক ভূগোলের ভারতবর্ষে আমরা ঢুকলাম আধঘন্টার মধ্যেই – কিন্তু পিতৃপুরুষের স্বপ্নের ভারতের সন্ধান এখনও চলছে।"[৫]

স্বাধীনতার আগে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে স্বপ্নের ভারতবর্ষে বংশপরম্পরায় বসবাস করবার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন তাদের প্রত্যেকেরই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল দেশভাগের দুঃসহ যন্ত্রনার পীড়নে। আজকের দিনেও যেন কেউ সেই আশাভঙ্গের মূল্য দিয়ে যাচ্ছে নানাভাবে।

বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট লেখক মলয়কান্তি দের 'আসরাফ আলির স্বদেশ' ছোটগল্পে রয়েছে দেশভাগের ফলশ্রুতিতে উচ্ছেদ হওয়া আরেকটি পরিবারের তীব্র দহনলিপি। গল্পকারের নিখুঁত বর্ণনায় আসরাফ আলির দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যেন আমরা নিজেদেরকে জড়িত করে ফেলি। আসরাফের জমিতে কাদের মিঞা নামে এক প্রতাপশালী লোকের নজর পড়েছিল, সে আসরাফের জমি দখলে নেবার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে। আসরাফ কখনো টিপছাপ দিয়েও কাদের মিঞার টাকা নেয়নি, তবু কাদের মিঞার মতো ধূর্তলোক মামলা সাজায়। অবশ্য করিমগঞ্জের আদালতে আসরাফের জিৎ হয়। মামলায় পরাজিত হয়ে কাদের মিঞা ষড়যন্ত্রের জাল বিছায়। তখন 'বহিরাগত সমস্যা' দেশজুড়ে মাথা চারা দিয়ে ওঠেছে এর ফলে কাদের মিঞার জালে আটকে পড়ে আসরাফ আলি। আসরাফ হঠাৎ করেই যেন 'বাংলাদেশি' বলে প্রমাণিত হয়। পুলিশের ভ্যানে অনিশ্চিত ভবিতব্যের দিকে যাত্রা করার সময় মনে পড়ে আসরাফের ছোটোবেলার সেই দিনের কথা, যেদিন তার বাপজানকে ইরফান চাচার চক্রান্তে পাকিস্তান ছাড়তে হয়েছিল। আসরাফের মায়ের মুখটি উজ্জ্বলভাবে তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। লেখকের ভাষায়—

> "সেদিন তার মায়ের কাছে কত কঠিন ছিল এই সাদামাঠা প্রশ্নটা। কোথায় যাবে তারা! কোথায়? সাতপুরুষের ভিটে, জমি-জিরেত কেন ছেড়ে দিতে হয়? কেন ফেলে আসতে হয় প্রিয়জন পরিজন? কোথায় পালাতে হয় রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে।"[৬]

আসরাফের চেতনায় নাড়া দেয় তার বাপজানকে প্রতারিত করেছিল জমিদার। তার বাপজানের কথায় ধরা পড়ে স্বদেশকে ছেড়ে যাওয়ার আর্তনাদ—

> "কপালে কিতা আছে জানি না। তবু যেলা আছি এর থাকি খারপ আর কিতা অইব। ইনো ত আইজ বাদে কাইল বিক্ষাত্ লামা লাগবো।"[৭]

তাদের পাশের বাড়ির নানাজি বলেছিলেন—

> "...যাইরায় যাও। হিন্দুস্থানে গিয়াউ কুনু মুখ পাইবায় নি। গেলা তো কত উ ..."[৮]

এই বৃদ্ধ নানাজির কথাই আসরাফের জীবনে সত্যি হয়ে দেখা দেয় অনেক বছর পর। আসরাফের বাপজানকেও পরিস্থিতি বাধ্য করেছিল সাত-পুরুষের ভিটে-বাড়ি ছাড়তে। সেদিন বালক আসরাফের মনে আনন্দের জোয়ার উথলে ওঠেছিল বাবা-মার সঙ্গে অন্য দেশে বেড়াতে যাবে বলে। তার কাছে দেশ ছাড়ার অভিজ্ঞতাটি ছিল মধুর। তার মনে হয়েছিল—

> "যেন হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ বেহশ্তে চলে আসা। পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্থান। ...কই কোনও বাধার প্রাচীর তো নেই কোথাও? যেন নেহাত এ পাড়া থেকে ও পাড়ায় যাওয়া। এই করে দুটো দেশ আলাদা হল? কী এক ঘোরের মতো যেন লেগেছিল আসরাফের। হিন্দুস্থান। ভারতবর্ষ। কোনও আলাদা দেশ নয়। খেতে পাবার একটু খানি আশ্বাস যেন..."[৯]

সেই আসরাফকেও কাদের মিঞার মতো লোকেরা আবার চক্রান্তে ফাঁসিয়ে ভিটে ছাড়া করতে তৎপর হয়। পুলিশ এসে তাকে 'বাংলাদেশি' বলে প্রমাণিত করে। আসরাফের মনে হয়েছিল তার পায়ের নীচের মাটি যেন সরে গেছে। লেখকের ভাষায়—

> "কী সব প্রশ্নোত্তর চলছিল তার ভাল খেয়াল নেই। কয়েকটি দুর্বোধ্য শব্দ মাথার চারপাশে ঘুরছে সিটিজেনশিপ, মাইগ্রেশন ইত্যাদি। দারোগা সাহেবের কথায় কী যেন বলেছিল আসরাফ। কড়া ধমক এল, হট! কেলা বহিরাগত।"[১০]

আসরাফের মতো অনেকজনকেই রাতের অন্ধকারে 'বহিরাগত' প্রমাণ করে পুলিশের ভ্যানে করে বাংলাদেশ সীমান্ত ছেড়ে দেওয়া হয়। যেখানে বীরেট অন্ধকার ছাড় কিছুই কারো চোখে পড়ে না। পুলিশের রুলের গুতোঁ, রাইফেলের ধাক্কা, মহিলাদের উপর নির্যাতন – এভাবেই ভাগ্যহীনদের কোথায় যেন ঠেলে দেওয়া হয়।

> "ক্রমাগত আঘাতে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না আর। অল্প এগোতে এগোতে লোকগুলো হঠাৎ একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে। মড়াকান্নার মতো। কান্নার রোল ওঠে অন্ধকার বনভূমি জুড়ে। লোকগুলো এগোতে, হোঁচট খায়, পড়ে, ওঠে, এগোয় – কোথায়? কে জানে!"[১১]

আসরাফের ছেলে আব্দুল বাবাকে জিজ্ঞেস করে তারা তো নিশ্চয়ই দেশে যাচ্ছে। আসরাফরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে 'নো ম্যান্‌স্ ল্যান্ড' বলা হয়। পৃথিবীর কোথাও তাদের মতো লোকদের 'স্বদেশ' নেই। পাকিস্তানে কেড়ে নিয়েছিল ইরফান চাচা আর হিন্দুস্থানে কাদের মিঞা। 'স্বদেশ' শব্দটাই অলীক স্বপ্নের মতো মনে হয়। তাই আসরাফ নিজেকে মানুষ বলে মনে করতে পারে না। কারণ তার কোনো অস্তিত্বই নেই। পৃথিবীর বুকে এমনিকরেই চেকপোষ্ট বসে আর মানুষের ফুসফুস দুটো যেন দুটো দেশে বিভক্ত হয়ে যায়।

এইভাবেই দেশভাগের ফলস্বরূপ বিপন্ন মানুষের নানান ধরনের মুখচ্ছবি, তাদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ইতিহাসের দলিলের মতো যেন আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মতো ভেসে ওঠে। আবার হয়তো আসরাফ আলির মতো কোনো লোককে পৃথিবীর মধ্যে জন্মলাভ করেও অনস্তিত্বের ভূমিকা পালন করতে হয়। তাই দেশভাগ আমাদের বাঙালি জীবনে এমনই এক গভীর ক্ষত যার সাময়িক যন্ত্রণা প্রশমিত হলেও বাঙালি হৃদয়ে এর দাগ রয়ে গিয়েছে চিরদিনের মতো। খণ্ড ভারত, খণ্ড বাংলার বিভিন্ন সমস্যা এই শতাব্দীতেও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চলছে এর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া অভাবনীয়। দেশভাগ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বিপুল সম্ভার রচিত না হলেও দেশভাগের স্মৃতি ও ঘটনাপ্রবাহ বিভিন্ন সাহিত্যিকদের রচনায় ভাষা পেয়েছে এবং তা প্রজন্মের পর প্রজন্মের লেখনীকেও শানিয়ে চলবে। দেশভাগের ফলশ্রুতিতে ভাষিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আমাদের বরাক উপত্যকায়ও বারবার প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছিল। বাংলার দেশভাগের সাহিত্য আজও যেন জীবন্ত প্রাণময় ও বহমান ঘটনা যার রেশ কখনো ফুরিয়ে যাবে না।

সূত্র নির্দেশ

১। 'হারানো দিন, হারানো মানুষ' (দ্বিতীয় পর্ব), সুজিৎ চৌধুরী, জ্যোতি প্রকাশনী, শিলচর, ২০১০।
২। 'বাংলা কথাসাহিত্যে দেশবিভাগ ও দাঙ্গা', প্রবন্ধ বিচিত্রা, সম্পাদনা ড. দেবেশ কুমার আচার্য, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ- ৯৪২।
৩। 'আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ', কেপি বাগচী এ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, ১৯৯৮।
৪। 'হারানো দিন, হারানো মানুষ' (দ্বিতীয় পর্ব), সুজিৎ চৌধুরী, জ্যোতি প্রকাশনী, শিলচর, ২০১০, পৃ- ২২২।
৫। ঐ, পৃ- ২২৩।
৬। 'আসরাফ আলির স্বদেশ', আত্মপরিচয়, মলয়কান্তি দে, প্রতিস্রোত, শিলচর, আসাম, ২০১৪, পৃ- ৫৯।
৭। ঐ, পৃ- ৫৯।
৮। ঐ, পৃ- ৫৯।
৯। ঐ, পৃ- ৫৯-৬০।
১০। ঐ, পৃ- ৬০।
১১। ঐ, পৃ- ৬১।
১২। 'ছিন্ন চিন্তা, ভিন্ন মত', সুজিৎ চৌধুরী, যুগশক্তি প্রকাশন, করিমগঞ্জ, ১৪১৫ বাংলা।